থির ! থির !!

[শিশুদের জন্য রচিত [illegible] পৃষ্ঠায় তিন রঙের ছবি যুক্ত. শ্রীযুক্ত কা[illegible]

[গ্রন্থকার ও প্রকাশক মেসার্স কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্সের অনুমত্যানুসারে [illegible] !]

শিশু

১ম বর্ষ,] আষাঢ়, ১৩১৯। [৩য় মাস।

থির ! থির !

বাপরে বাপ ! সাবাস জোয়ান !
কত বড় বীর !—
আপ্‌না হ'তেই পার্‌লে হ'তে
দুটি পায়ে 'থির' !

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

ছাত্রজীবন

সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড্।

আজ মহারাণী ভিক্টোরিয়া পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগর আনন্দস্রোতে প্লাবিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী আনন্দে বিহ্বল হইয়া বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের নিকট যুবরাজের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে। শত শত গির্জ্জার আনন্দসূচক ঘণ্টাধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। কামান সমূহ দশদিক কম্পিত করিয়া আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করিতেছে। পুত্র-মুখ দর্শন করিয়া মাতা ভিক্টোরিয়া ও পিতা এলবার্টের আর আনন্দের সীমা নাই। যুবরাজের জন্ম সংবাদে বৃটিশ সাম্রাজ্যে দুই দিন আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল। তৃতীয় দিন মহারাণীর আদেশে শত শত বন্দী কারামুক্ত হইল; অসংখ্য গরীব, দুঃখী, অন্ধ, আতুর প্রভৃতি ভিক্ষার্থী প্রচুর পরিমাণে অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্য পাইয়া আনন্দিত চিত্তে ভগবানের নিকট যুবরাজের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

রাজকুমারের একমাস বয়সেই তিনি "প্রিন্স অব ওয়েলস" ও "আরল অব দি চেষ্টার" উপাধিতে ভূষিত হইলেন। চিরাগত প্রথানুসারে এক মাসের শিশুর মস্তকে স্বর্ণ-মুকুট, অঙ্গুলিতে স্বর্ণাঙ্গুরী, হস্তে সুবর্ণ নির্ম্মিত রাজদণ্ড ও কোমরে কোমরবন্ধ পরাইয়া তাহাতে সুবর্ণের তরবারী ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

কুমারের নামকরণ উৎসব অতিশয় জাঁক জমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাণী কুমারকে বহুমূল্য বেশভূষায় বিভূষিত করিয়া সুসজ্জিত ভজনালয়ে লইয়া গেলেন। রাজকুমারের মুখচন্দ্র দর্শন করিবার জন্য রাজপথ ও ভজনালয় লোকাকীর্ণ হইল। কেণ্টারবারীর প্রধান যাজক জর্ডন নদীর পবিত্র জলে কুমারকে অভিষিক্ত করিয়া এলবার্ট এডোয়ার্ড নাম রাখিলেন। এই নামকরণ কার্য্যে সেই দিন প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

কুমার বাল্যকাল হইতেই সুশিক্ষকের শাসনে থাকিয়া যাহাতে সৎ ও বিনীত হয়, মাতাপিতা সেইজন্য লেডী লিটল্টন নাম্নী এক সচ্চরিত্রা গুণবতী মহিলাকে কুমারের ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার যত্নে কুমার চন্দ্রের কলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শিক্ষয়িত্রীর হস্তে কুমারের শিক্ষাভার অর্পণ করিয়াই মাতাপিতা নিশ্চিন্ত রহিলেন না, তাঁহারাও প্রাণাধিক পুত্রের সুশিক্ষার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন।

সন্তান যাহাতে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ভগবদ্ভক্ত হয়, সেইজন্য

মাতাপিতা প্রতিদিন তাঁহাকে লইয়া উপাসনা করিতেন এবং ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প বলিতেন। জীবের প্রতি দয়া সঞ্চার করিবার জন্য, পশুশালার পশুদিগকে খাদ্যাদি প্রদান করিয়া সহৃদয়তা দেখাইতেন। তাহাদের নাম বলিতেন এবং আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় দিতেন। পুত্রের হস্তে অর্থ বস্ত্র খাদ্যাদি দিয়া দীন দুঃখী অন্ধ আতুরদিগকে দান করিতে উপদেশ দিতেন এবং তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। পিতামাতা কুমারকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র তটে ভ্রমণ করিতেন এবং তাঁহাকে প্রাকৃতিক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা পাইতেন। কুমার সুনীল সাগরপ্রান্তে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেন। এইরূপে তাঁহারা নিত্য নূতন স্থান, নিত্য নূতন দৃশ্য ও নূতন নূতন বস্তু দেখাইয়া কুমারের কৌতুহল বৃদ্ধি করিতেন। যাহাতে পুত্রের প্রাণে জ্ঞানের পিপাসা বলবতী হয়, ভগবদ্ভক্তিতে চিত্ত আপ্লুত থাকে, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে, তৎসাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ থাকিতেন।

যিনি ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিবেন, তাঁহার সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রতার উপর ইংলণ্ডের কেন, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল ন্যস্ত রহিয়াছে। এই কথা মনে করিয়া পিতামাতা সপ্তম বর্ষেই রাজকুমারের শিক্ষাভার রেভারেণ্ড হেন্‌রি বার্চ্চ নামক একজন ধর্ম্মযাজকের হস্তে অর্পণ করিলেন। উপযুক্ত ধর্ম্মযাজকের সংসর্গে ও সদুপদেশে রাজকুমারের

হৃদয় সুবিমল জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতে লাগিল। রাজকুমার শিক্ষক মহাশয়কে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন। তিনি যখন যে আদেশ করিতেন অবনত মস্তকে তাহা পালন করিতেন। যে দিন তিনি শুনিলেন তাঁহার শিক্ষক কার্য্যত্যাগ করিয়াছেন, সেইদিন তিনি আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়াছিলেন এবং একখানি ভক্তিপূর্ণ পত্রসহ কতকগুলি মূল্যবান্ উপহার গোপনে তাঁহার বিছানার উপর রাখিয়াছিলেন।

এলবার্ট কেবল পুস্তকগত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি পুস্তকগত বিদ্যা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সন্তানদিগকে যে বিষয় শিক্ষা দিতেন, তখন সেই বিষয়ের পদার্থগুলি ভালরূপে দেখাইয়া তাহার দোষ গুণের বিচার করিতেন। যাহাতে সন্তানগণের শরীরে আলস্য বা বিলাসিতা না জন্মে, সেই জন্য তিনি অসবরণ প্রাসাদের নিকট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চারিদিকে উদ্যান ও কর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যুবরাজ স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ ও বৃক্ষ রোপণ করিতেন, জল সিঞ্চন করিয়া বৃক্ষ সকল সজীব রাখিতেন। তাঁহার বাগানের শাকসব্জী, মনোহর সুগন্ধি ফুল ও সুস্বাদু ফল সর্ব্বদা পিতামাতার আনন্দ বৰ্দ্ধন করিত। গাভীগুলিকে যত্নের সহিত খাদ্য ও পানীয় যোগাইতেন। তদুৎপন্ন দুগ্ধে ক্ষীর, সর ও নবনীত প্রস্তুত করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতেন। রাজকুমার

মাতাপিতা প্রতিদিন তাঁহাকে লইয়া উপাসনা করিতেন এবং ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প বলিতেন। জীবের প্রতি দয়া সঞ্চার করিবার জন্য, পশুশালার পশুদিগকে খাদ্যাদি প্রদান করিয়া সহৃদয়তা দেখাইতেন। তাহাদের নাম বলিতেন এবং আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় দিতেন। পুত্রের হস্তে অর্থ বস্ত্র খাদ্যাদি দিয়া দীন দুঃখী অন্ধ আতুরদিগকে দান করিতে উপদেশ দিতেন এবং তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। পিতামাতা কুমারকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র তটে ভ্রমণ করিতেন এবং তাঁহাকে প্রাকৃতিক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা পাইতেন। কুমার সুনীল সাগরপ্রান্তে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেন। এইরূপে তাঁহারা নিত্য নূতন স্থান, নিত্য নূতন দৃশ্য ও নূতন নূতন বস্তু দেখাইয়া কুমারের কৌতূহল বৃদ্ধি করিতেন। যাহাতে পুত্রের প্রাণে জ্ঞানের পিপাসা বলবতী হয়, ভগবদ্ভক্তিতে চিত্ত আপ্লুত থাকে, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে, তৎসাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ থাকিতেন।

যিনি ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিবেন, তাঁহার সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রতার উপর ইংলণ্ডের কেন, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল ন্যস্ত রহিয়াছে। এই কথা মনে করিয়া পিতামাতা সপ্তম বর্ষেই রাজকুমারের শিক্ষাভার রেভারেণ্ড হেন্‌রি বার্চ্চ নামক একজন ধর্ম্মযাজকের হস্তে অর্পণ করিলেন। উপযুক্ত ধর্ম্মযাজকের সংসর্গে ও সদুপদেশে রাজকুমারের

হৃদয় সুবিমল জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতে লাগিল। রাজকুমার শিক্ষক মহাশয়কে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন। তিনি যখন যে আদেশ করিতেন অবনত মস্তকে তাহা পালন করিতেন। যে দিন তিনি শুনিলেন তাঁহার শিক্ষক কার্য্যত্যাগ করিয়াছেন, সেইদিন তিনি আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়াছিলেন এবং একখানি ভক্তিপূর্ণ পত্রসহ কতকগুলি মূল্যবান্ উপহার গোপনে তাঁহার বিছানার উপর রাখিয়াছিলেন।

এলবার্ট কেবল পুস্তকগত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি পুস্তকগত বিদ্যা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সন্তানদিগকে যে বিষয় শিক্ষা দিতেন, তখন সেই বিষয়ের পদার্থগুলি ভালরূপে দেখাইয়া তাহার দোষ গুণের বিচার করিতেন। যাহাতে সন্তানগণের শরীরে আলস্য বা বিলাসিতা না জন্মে, সেই জন্য তিনি অসবরণ প্রাসাদের নিকট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চারিদিকে উদ্যান ও কর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যুবরাজ স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ ও বৃক্ষ রোপণ করিতেন, জল সিঞ্চন করিয়া বৃক্ষ সকল সজীব রাখিতেন। তাঁহার বাগানের শাকসব্জী, মনোহর সুগন্ধি ফুল ও সুস্বাদু ফল সর্ব্বদা পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিত। গাভীগুলিকে যত্নের সহিত খাদ্য ও পানীয় যোগাইতেন। তদুৎপন্ন দুগ্ধে ক্ষীর, সর ও নবনীত প্রস্তুত করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতেন। রাজকুমার

স্বহস্তে বৃক্ষ ছেদন করিয়া টুল, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন। সকল কার্য্যেই ইনি ভগ্নীগণের নিকট সাহায্য পাইতেন। বস্তুতঃ মাতাপিতাই সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের প্রধান সহায়। ভিক্টোরিয়ার ন্যায় মাতা ও এলবার্টের ন্যায় পিতা পাইয়াই আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ এত সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

কেবল অধ্যয়ণ জনিত শিক্ষায় মানবের সকল শিক্ষার পূর্ণতা হয় না। নানা দেশের আচার ব্যবহার সভ্যতা প্রভৃতি শিক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এইজন্য অল্প বয়সেই দেশ-ভ্রমণ-জাত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য রাজকুমারকে জর্ম্মণী ও সুইজারলণ্ড পাঠান হইল। তিনি সকল স্থানে সকলের নিকট সমভাবে সমাদৃত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ আয়র্লণ্ড ভ্রমণে গমন করেন। তৎপর তিনি এডিনবরায় রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন শিক্ষক এমনিয়া দিয়া যুবরাজের হস্ত ধৌত করিয়া, দ্রবীভূত সীসক পাত্রে হস্ত ডুবাইতে অনুমতি করিলেন। গুরুভক্ত ছাত্র শিক্ষকের আদেশে দ্বিরুক্তি না করিয়া বিস্মিত হৃদয়ে গলিত সীসক পাত্রে হস্ত নিমজ্জিত করিলেন। শিক্ষকের বাক্যে এইরূপ বিশ্বাস না করিলে কেহ কখনও শিক্ষালাভ করিতে পারে না।

১৮৫৫ সালে রাজকুমার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অতঃপর ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্ত্তি হইয়া নিয়মিত সময়ে তথাকার উপাধিলাভ

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষাকে সপ্তম এডোয়ার্ড।

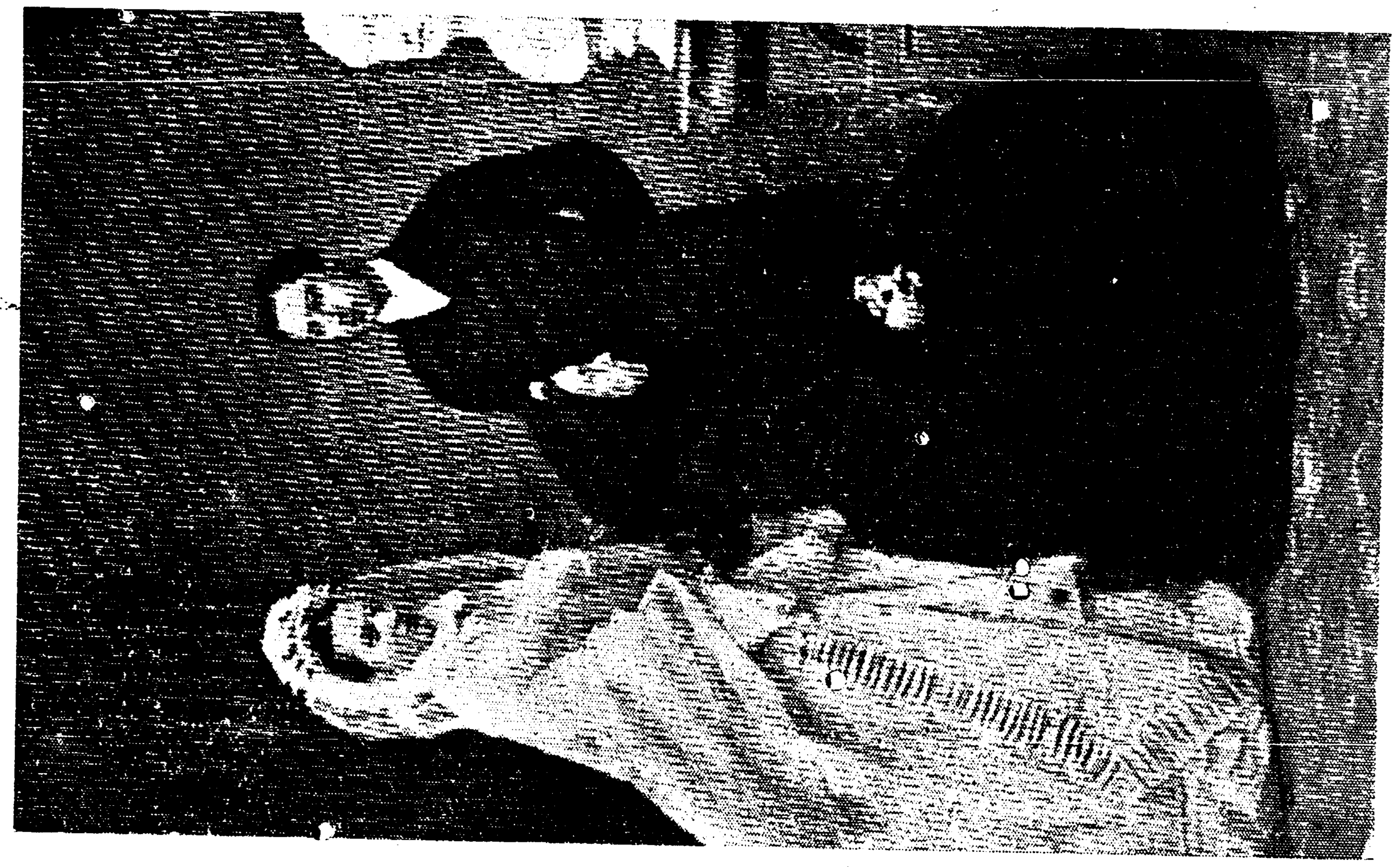

বিবাহদিবসে সপ্তম এডোয়ার্ড ; রাণী আলেকজান্ড্রা ও মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

সৈনিক বেশে সপ্তম এডোয়ার্ড।

করেন। ১৮৬১ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিদ্যালয় হইতে বারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৪ সালে ডি, সি, এল, উপাধি লাভ করেন। এইং সময়েই তিনি যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং নৌকা চালনা ও ব্যাট বল খেলায়ও কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। বিংশতি বৎসর অতিক্রম না করিতেই যুবরাজ গ্রীক, লাটিন, ফরাসী ও জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। একমাত্র মনোযোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত নিয়মিতরূপ পাঠাভ্যাস করিয়াই যুবরাজ এত অল্প বয়সে বহু বিদ্যায় ও বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ খৃঃ ডেন্মার্কের রাজকুমারী আলেকজেন্দ্রার সহিত যুবরাজের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ লণ্ডন নগরে মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। নববধূকে দেশ বিদেশের রাজাগণ ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের উপহার এবং ইংলণ্ডবাসিগণ দেড়লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তাহার দিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন।

যুবরাজ বিদ্যা শিক্ষা শেষ করিয়া সাধারণের হিতজনক কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। যথা সময়ে রাজকার্য্যেও মাতার সাহায্য করিতেন। তিনি ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান স্থান সকল পরিদর্শন করেন। দেশীয় রাজাদের সাদর অভ্যর্থনায় এবং ভারতীয় প্রজার রাজভক্তিতে তিনি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-

আগমন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নানা স্থানে সাধারণের হিতজনক অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাঁহার দয়া, ন্যায়পরতা ও প্রজা-বাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে প্রজারা বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বহু মূল্য উপঢৌকন সহ বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতের সমৃদ্ধি ও ভারতীয় রাজগণের আদর অভ্যর্থনা ও প্রজাদের রাজভক্তির বর্ণনা করিয়া মাতা ভিক্টোরিয়া ও ইংলণ্ডবাসীদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

১৯০০ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য অতল শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ভারতীয় প্রজাগণ মাতৃহীন শিশুর ন্যায় একেবারে শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের সুখ-শান্তি, আমোদ-আহ্লাদ, হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল; কি যেন আশঙ্কা, কি যেন উদ্বেগ তাহাদের শোকাভিভূত হৃদয়কে আরও উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। যখন আমাদের যুবরাজ রাজমুকুট ও রাজদণ্ডে বিভূষিত হইয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য অবনত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বশ্যতাস্বীকার করিলেন, তখন ভারতেও আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। ভারতীয় রাজা ও প্রজাগণ তাহাদের সম্রাট্‌কে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি-উপহারে পূজা করিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মমতানুসারে ভগবানের উপাসনা করিয়া

ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

উট পক্ষী।

ওগো "শিশুর" অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকাগণ, তোমরা কি কখন কলিকাতার চিড়িয়াখানায় উটপক্ষী দেখিয়াছ? আজ আমি তোমাদিগকে উহার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

পক্ষী জাতির মধ্যে গুণ-গুণ-কারী পক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং উটপক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আফ্রিকা ও আসিয়ার তপ্তবালুকাময় মরুভূমিই ইহাদের বাসস্থান। আরববাসীরা ইহাদের গলদেশ ও শরীরের আকার উটের মত বলিয়া ইহা-দিগকে "উটপক্ষী" বলিয়া থাকে। উটের ন্যায় এই পক্ষীও মরুভূমির মধ্যে বাস করে এবং অনেক দিবস জল পান না করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহারা সাধারণতঃ দশ ফিট্ উচ্চ হইয়া থাকে। যদিও উটপক্ষীর পক্ষ আছে, তথাপি সেগুলি তাহাদের পক্ষে এত ছোট যে তদ্দ্বারা উড়িতে পারে না। কিন্তু দৌড়িবার সময় সেই গুলিকে দাঁড়ের ন্যায় ব্যবহার করে। পাখা দুইটা বিস্তার করিয়া এবং সঞ্চালিত করিয়া এত দ্রুতবেগে দৌড়িয়া যায় যে দ্রুতগামী অশ্বকেও ইহার সঙ্গে দৌড়াইয়া হার মানিতে হয়।

ইহারা না খায়, এমন জিনিস নাই। ছোট ছোট পশু, পক্ষী, সাপ, পোকা-মাকড় প্রভৃতিত খায়ই ইহা ভিন্ন ইট পাথর লোহা প্রভৃতির টুকুরাও খাইয়া থাকে। মৃত উটপক্ষীর প্াকস্থলিতে ঐ প্রকারের বহু জিনিষ পাওয়া যায়।

উটপক্ষী খড়পাতার দ্বারা বাসা প্রস্তুত করে না। তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির একটী সামান্য গর্ত্তই ইহাদের বাসা।

তাহাতে মেয়ে উটপক্ষীটী দশ কি বারটী ডিম্ব প্রসবকরে, এবং অতিশয় যত্নপূর্ব্বক বাসার চারিদিকে চৌকি দেয়। রাত্রে সর্ব্বদাই ডিমগুলির উপর বসিয়া তা দেয় এবং দিবসে কেবল মাত্র অত্যাব উষ্ণ সময় এইগুলিকে পরিত্যাগ করে। এই সকল ডিম সাধারণ হাঁসের ডিমের প্রায় বিশগুণ বড়; রং ফিকে হল্‌দে। আরবদেশীয় লোকগণ ইহার ডিম্ব গুলিকে নানাপ্রকার খাদ্যে পরিণত করে ও খোসাগুলি দ্বারা নানাপ্রকার গহনা ও বাটী প্রস্তুত করে। দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রায়ই উটপক্ষী শিকার করা হয়।

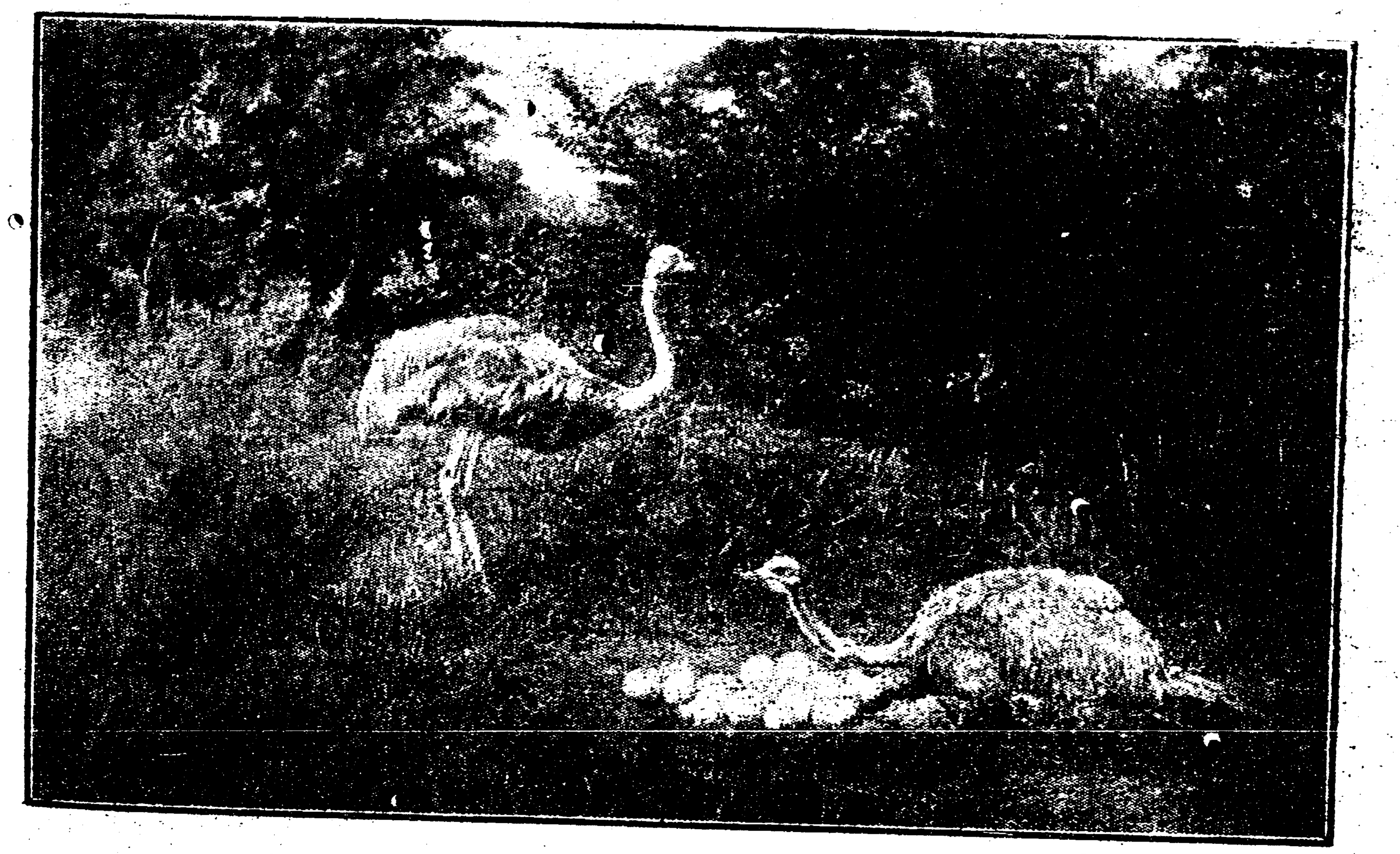

ইহারা কখনও সোজাভাবে দৌড়ায় না; সুতরাং শিকারীকে ভয়ানক নাকাল হইতে হয়। শিকারী ইহাদের সহিত দৌড়াইতে থাকে, যখন দৌড়াইতে দৌড়াইতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন

ইহারা কেহ দেখিতে পারিবে না ভাবিয়া বালুকার মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া দেয়; তখন শিকারী ইহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। সময় সময় শিকারিগণ ইহার চর্ম্ম পরিধান করিয়াও ইহাদিগের নিকট গমন করিয়া শিকার করে।

মোফ্যাট্ নামক একজন ইংরাজ আফ্রিকার অসভ্যজাতির উটপক্ষী শিকারের প্রণালী সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

একটী দেশীয় লোক একটী উটপক্ষীর চর্ম্ম ও পালকে নিজ শরীর আচ্ছাদিত করে। এবং এইরূপে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে একদল উটপক্ষীর নিকট গমন করে। সে মাটিতে

ঠোকর মারিয়া এবং পালক সঞ্চালিত করিয়া প্রকৃত পক্ষীর অনুকরণ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোন পক্ষীর এত নিকটে না আইসে যে তীর মারিয়া তাহাকে আঘাত করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত লাফাইয়া লাফাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। তারপর সে দলের মধ্যে একটীর উপর বিষ মিশ্রিত তীর নিক্ষেপ করে এবং প্রায়ই সে তাহার শিকার আয়ত্ব করিতে কৃতকার্য্য হয়। একজন ভ্রমণকারী বলেন যে, তিনি একদা একটী ছোট উটপক্ষীকে এমন পোষ মানিতে দেখিয়াছেন যে, সে একটী ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ বালককে তাহার পিঠের উপর আরোহণ করিতে দিত। পিঠের উপর ভার বোধ হইলেই সে দৌড়িতে আরম্ভ করিত। প্রথমতঃ সে দ্রুতবেগে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিত তৎপরে পাখা দুইটী বিস্তার করিয়া গ্রামের চারিদিকে ঘোড়দৌড়ের অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে দৌড়িয়া বেড়াইত।

উটপক্ষী ডানার সুন্দর শ্বেতবর্ণ পালক ও পুচ্ছের জন্যই প্রধানতঃ এত আদৃত হয়। অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকা হয়তো জান না যে, ইংলণ্ডের যুবরাজের কিরীটের চূড়া তিনটী শ্বেতবর্ণ উটপক্ষীর পালকে নির্ম্মিত এবং তাহাতে "আমি অধীন" এই ক্ষুদ্র সার বাক্যটী লেখা আছে।

ইহার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে—১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রোহেমিয়ার রাজা হত হন, তাঁহার মুকুটে এই পক্ষযুক্ত অলঙ্কারে ঐ সারবাক্য লিখিত ছিল। ব্ল্যাক প্রিন্স

নামে অভিহিত জয়ী ইংলণ্ডের যুবরাজ এডোয়ার্ড, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স সেই লেখাটী গ্রহণ করেন এবং সেই সময় হইতেই ব্রিটিশ-সম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীরা সেই লেখাটী কিরীটের উপর গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার।

শ্রীমন্ত সওদাগর।

১

এই দেশে ছিল রে ভাই
ধনপতি সওদাগর,
বার বৎসরের তরে সাধু
গেলেন সফর।
সিংহল পাটন দেশটি—সে যে
সমুদ্রের ওপার,
সাতডিঙ্গা সাজায়ে গেলেন
সেই দেশের মাঝার।

২

সিংহল পাটন যাইতে রে
কালীয়দহের জলে,
দেখিলেন সাধু কমলে বসিয়া
কামিনী মাতঙ্গ গিলে।

অদ্ভুত মানিয়া কহিলেন সাধু
রাজারে সভায় গিয়া
দেখিতে আইলা সিংহলের রাজা
সৈন্য সামন্ত নিয়া।

৩

অগাধ সাগরে কমলের বন,
সে যে রে চণ্ডীর ছল,
দেখাতে নারিয়া হায় রে সাধুর
আঁখি করে ছলছল।
বিপাকে পড়িয়া হইলা রে বন্দী
সাধু সে সিংহল দেশে,
রাজা লুটি নিল ডিঙ্গার ধন
মাঝি পলাইল ত্রাসে।

৪

উজানী নগরে বালক শ্রীমন্ত
সাধুর নন্দন সে রে,
জনম অবধি জানে না বালক
জনক তাহার কে রে।

শ্রীমন্তের কমলে কামিনী দর্শন।

কহিতে না পারি পিতৃ-পরিচয়,
লজ্জায় মলিন বদনে,
ডিঙ্গা সাজাইয়া দুধের বালক
চলিল দক্ষিণ পাটনে।

৫

বিদায় দিল তারে উজানীর রাজা
(কাঁদিয়া) বিদায় দিল মায়,
ডিঙ্গা বাহিয়া শ্রীমন্ত সওদাগর
সিংহল পাটনে যায়।
যাইতে যাইতে সাধুর নন্দন,
দেখিল কালীদ জলে,
কমল কাননে বসিয়া কন্যা
গজ উগারি গিলে।

৬

কহিলা এ বার্ত্তা সাধুর নন্দন
রাজার সভায় গিয়া,
সিংহলের রাজা আসিলা দেখিতে
সৈন্য সামন্ত নিয়া।

চণ্ডীর কৃপায় ফুটিল কমল
অগাধ কালীদ জলে,
দেখিলা নৃপতি উগারিয়া গজ
ধরে বামা লীলাচ্ছলে।

৭

শ্রীমন্তের সনে সিংহলের রাজা
কন্যার দিলেন বিয়া,
বাপেরে আনিল খুঁজিয়া শ্রীমন্ত
বন্দীখানাতে গিয়া।
পুত্র খুলিল বাপের বন্ধন
বৎসর বার পরে,
সিংহাসনে আনি বসাইলা রাজা
ধনপতি সওদাগরে।

৮

বাপের বেটার সাত সাত ডিঙ্গা
ভরিয়া দিলেন রায়,
পুত্র আর বধূ নিয়া ধনপতি
উজানী নগরে যায়।

শুনিয়া সকলে সিংহলের কথা
রহিল বিস্ময়ে চাহিয়া,
ধন্য ধন্য ধন্য কহে পুরজন
শ্রীমন্তের গুণ গাহিয়া।

বটুক।

সহরের অতি সন্নিকটে বনের ধারে বটুক বাস করিত। বটুক ছাগল হ'লেও একটু সভ্য ভব্য রকমের ছিল। সে সহরের উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, মাষ্টার সকলের গৃহে গৃহে প্রত্যহই ঘুরিয়া খবর বার্ত্তা নিয়া বেড়াইত; সকলেই বটুককে আদর যত্ন করিত। এরূপ হইলে সকলেই আদর করিয়াও থাকে। সহরের ছেলেরা বটুককে আদর করিয়া "বিদ্যালঙ্কার" বলিয়া ডাকিত এবং আসিলে তাহাকে খাবার খে'তে দিত। এইরূপে বটুকের দিন যে'তে লাগল।

বটুকের অনেকগুলি বাচ্ছা ছিল। তাহাদিগকে প্রতিপালন ও শিক্ষা প্রদানের জন্যই বটুককে প্রত্যহ সহরে কাজ কর্ম্ম দেখিতে হইত। কার্য্যান্তে সে যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ফিরিয়া তাহার সন্তানগুলিকে ডাকিত ও বাচ্চাগুলি আকুল হ'য়ে "মা মা" ডাকিয়া লাফাইয়া তাহার উপরে পড়িত তখন সে

কত আনন্দ পাইত। এইরূপ আনন্দ ও শান্তির ভিতর দিয়া বটুকের ছেলেপিলেগুলি লইয়া বেশ চলিতেছিল।

এই যে শান্তি ও সুখ তার মধ্যেও বটুকের একটা চিন্তা ছিল। সে চিন্তা নেকড়ে বাঘের। বটুক যতক্ষণ বাহিরে থাকিত ততক্ষণ সে কেবল এই চিন্তাই করিত—"হায়, নেকড়ে আমার বাচ্চাগুলিকে বুঝি বা খাইয়া ফেলিল।" বটুক সহরে যাইবার বেলায় যদিও অতি সাবধানে তাহার গৃহের দরজাটী আটকাইয়া যাইত—যদিও অতি সাবধানে বাচ্চাগুলিকে শিখাইয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার নিজের আগমন ভিন্ন কদাপি প্রবেশ দ্বার খুলিয়া রাখা না হয়, তথাপি মায়ের প্রাণ তাহা বুঝিত না। প্রতি মুহূর্ত্তে সন্তানের বিপদ আশঙ্কা করিয়া অস্থির হইত। এইরূপ আশঙ্কা ও চিন্তার পর গৃহে আসিয়া যখন সে বাচ্চাগুলির "মা মা" ধ্বনি শ্রবণ করিত ও লম্ফ ঝম্ফ দর্শন করিত, তখন সে স্বর্গসুখ অনুভব করিত। এইরূপে দিন চলিতে লাগিল।

বটুকের বাড়ীর নিকট ছিল এক নেকড়ে বাঘ। বটুকের কচি কচি বাচ্চাগুলি দেখিয়া দেখিয়া নেকড়ে অস্থির হইয়া উঠিল। পেটুক ছেলের মণ্ডা দেখিলে যেমন দশাটী হয়, নেকড়ে বাঘেরও ঠিক সেই দশাটী উপস্থিত হইল। নেকড়ের মুখের লাল ঝরিতে লাগিল। একদিন সে ঝিম ধরিয়া বসিয়া রহিল। দেখা যাউক কখন বটুক বাহির হইয়া যায়।

যথা সময়ে বটুক স্নান আহার সমাপন করিয়া পোষাক

করিল। তারপর লাঠিটী ও থলেটী লইয়া দুর্গা নাম করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। বটুক যেই বাড়ী হইতে বাহির হইল অমনি ভিতর হ'তে দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

বটুক বাহির হইয়া যাইবার অল্লক্ষণ পরেই বাঘ আসিয়া

দরজায় দাঁড়াইল এবং বটুক যেরূপ করিয়া সঙ্কেত করিলে বাচ্চাগুলি ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দেয়, ঠিক সেইরূপ সঙ্কেতে দরজা ঠেলিয়া বটুকের মত করিয়া ডাকিতে লাগিল।

"হেঁ—ভেঁ—মেঁ—দোর খুলে দে—"

বটুকের বাচ্চাগুলি দেখিল এ তাহার মায়ের ডাক নয়। তাহারা দরজা খুলিয়া দিল না। বলিল, "এ ত আমাদের মায়ের আওয়াজ নয়। আমাদের মায়ের অতি সুন্দর আওয়াজ। তুমি আমাদের মা নও, আমরা দ্বার খুলিব না।" বাঘের কার্য্য সিদ্ধ হইল না, সে চলিয়া গেল।

বাঘ বাজারে গিয়ে এক পয়সার চকখড়ি কিনিয়া খাইল ও তৎপর গলাজলে নামিয়া খুব গান গাইল। এইরূপে বাঘের আওয়াজ বেশ মিষ্টি হইল। তারপর পুনরায় বটুকের দরজায় আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধাক্কা দিয়া ঠিক বটুকের ন্যায় বলিতে লাগিল।

"হেঁ—ভেঁ—মেঁ—দোর খুলে দে—"

বাচ্চাগুলি এইবার বুঝিল এ তাহাদের মায়ের শব্দই বটে, কিন্তু বাঘ যে পা তুলিয়া দরজা ধরিয়াছিল সে পা দেখিয়া সকলে ভয় পাইয়া গেল, দরজা খুলিতে আসিয়া আর খুলিল না। সকলে বলিল "এ পা আমাদের মায়ের নহে, আমাদের মায়ের নহে, আমাদের মায়ের পা সাদা এবং তাহাতে এরূপ নখ নাই— আমরা দরজা খুলিব না।"

বাঘ কি করে? পুনরায় চলিয়া গেল। গিয়া সেই চক

গুঁড়া করিয়া পায়ে লেপে দিল। আর এক পয়সার ময়দা কিনিয়া ময়দার লাড্ডু করিয়া নখগুলি বন্ধ করিয়া দিল। তার পর পুনরায় আসিয়া ডাকিল—

"হেঁ—ভেঁ—মেঁ—দোর খুলে দে—"

বাচ্চারা ভাবিল এবার বুঝি তাদের মাই আসিয়াছে। কিন্তু পা কোথায়? বাঘ সাদা ধপ্ ধপে পা দুটী জানালা দিয়া তুলিয়া ধরিল; দেখিয়া এবার আর কারো সন্দেহ রইল না। তাহারা সকলে দ্বার খুলিয়া দিল।

বাঘ লাফাইয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আর কোথা যায়? বাঘ বাচ্চা গুলিকে ধরিতে লাগিল, আর মুখে গুঁজতে লাগিল।

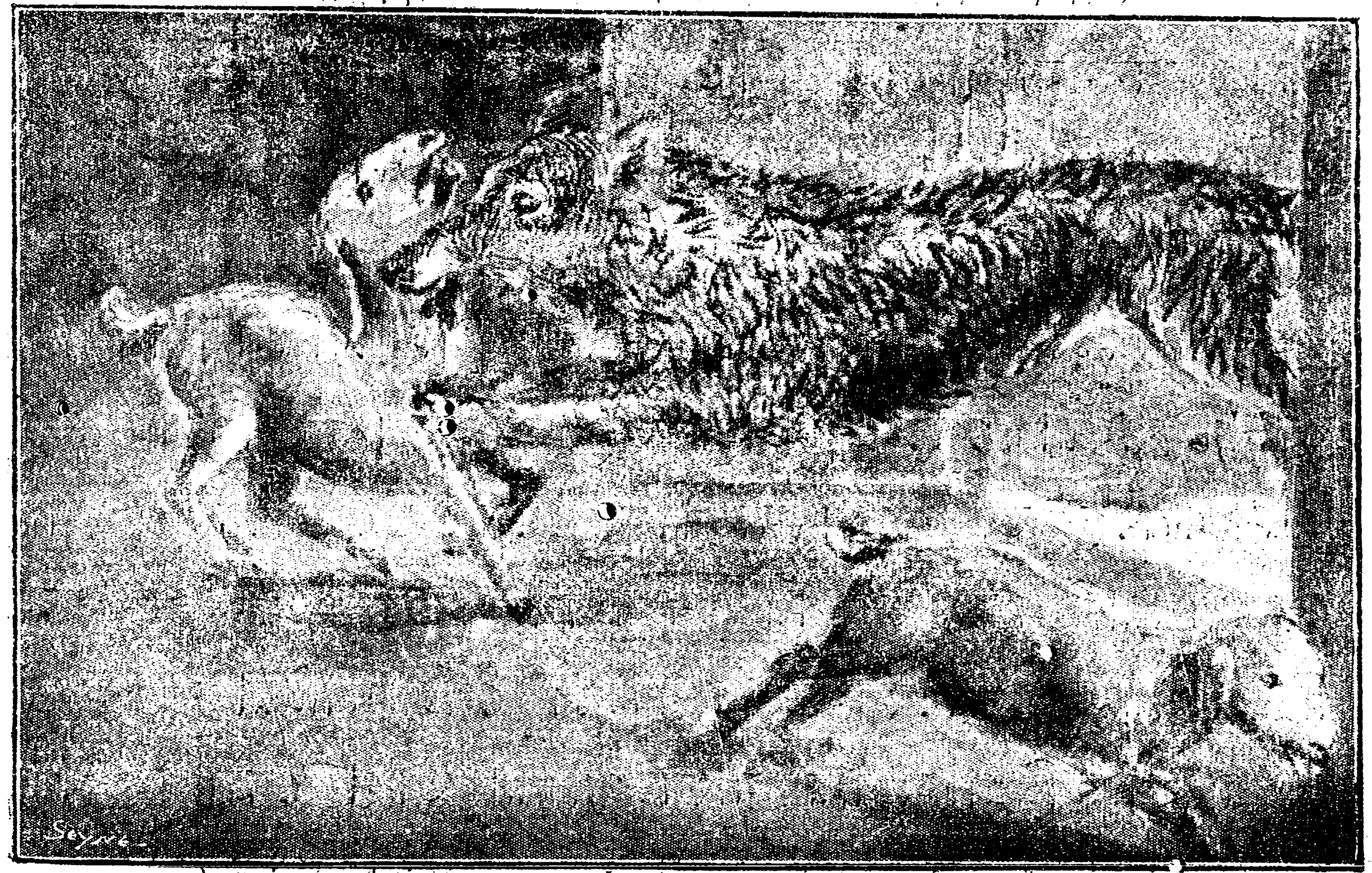

হটু ছিল সকলের ছোট, সে ছিল সকলের পাছে। হটু দৌড়িয়া গিয়া দেয়ালের উপর ঘড়ীর বাক্সে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। বাঘ তাহাকে দেখিতেও পাইল না। বাঘ পেট ভরিয়া খাইয়া মহানন্দে চলিয়া গেল।

যথা সময়ে বটুক সহর হইতে বাড়ী আসিয়া দরজা খোলা দেখিয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছে বুঝিতে পারিল। ছেলে গুলিকে না দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। মায়ের কন্না শুনিয়া হটু সাহসে ভর করিয়া নামিয়া আসিল এবং সকল কথা খুলিয়া বলিল। তার পর মা ও মেয়েতে অনেক ক্ষণ কান্দিল। আহা, তাহাদের আজ কি দুঃখ!

বাঘ বাচ্চা গুলিকে খাইয়া ফেলিয়াছে—এ কথায় বটুক সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিল না। মায়ের মন এইরূপই হয়। অন্যান্য বাচ্চা গুলিও হয় ত হটুর ন্যায় অন্য কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছে। বটুক এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইল।

খানিকটা জঙ্গলের দিকে আসিয়া বটুক দেখিল বাঘ পেট ভরিয়া খাইয়া পেটের ভারে ঘুমাইতেছে। দেখিয়াই বটুক এক দৌড়ে ডাক্তারের বাড়ীতে গেল। সেখানে এক দিন সে দেখিয়াছিল যে ডাক্তার এক রোগীর নাকের নিকট একটি শিশি ধরিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া পেট কাটিয়া কতকগুলি কি বাহির করিয়া আবার মাংস পুরিয়া তাহা সেলাই করিয়া দিয়াছেন। বটুকের সে কথা স্মরণ ছিল। তাই সে ডাক্তার বাড়ী হইতে সেই ঔষধ, ছুঁচসুতা ও ছুরি লইয়া আসিল। বাঘ তখনও পেটের ভারে ঘুমাইতেছিল।

বটুক ধীরে ধীরে যাইয়া বাঘের নাকের নিকট শিশি ধরিয়া বহুক্ষণ রাখিল। তার পর আস্তে আস্তে বাঘের পেট কাটিতে লাগিল। যেই কাটা, আর অমনি সা—রে—গা—মা—পা—ধা—ভেঁ—ভেঁ—করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া একে একে সবগুলি বাচ্চা বাঘের পেট হইতে বাহির হইতে লাগিল। বাঘ বাচ্চাগুলিকে আস্ত আস্ত খাইয়াছিল, তাই হজম হয় নাই—পেটের অসুখে ঘুমাইয়াছিল—এইবার খুব আরাম পাইল—আরামে নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে লাগিল—কিছুতেই টের পাইল না।

বাচ্চাগুলি তখন বড় বড় পাথর আনিয়া বটুককে দিল। বটুক তাহা বাঘের পেটের ভিতর পূরিয়া ছুঁচ ও সূতা দ্বারা তাড়াতাড়ি করিয়া বাঘের পেট সিলাই করিয়া বাচ্চাগুলিসহ চলিয়া আসিল। আজ তাহাদের কি আনন্দ!

ঘুম ভেঙ্গে বাঘত আর হাটিতে পারে না। পাথর গুলি পেটের ভিতর গড়া গড়ি যাইতে লাগিল। পিপাসাও খুব হইয়াছিল, পাকা ফলার কি না?

জল খাইবার ইচ্ছায় উঠিয়া বাঘ যেই নদীতে নামিতে গেল অমনি পাথরের ভারে একেবারে যাইয়া নদীতে পড়িয়া গেল। এই যে পড়িল আর উঠিল না।

দুর্ব্বল ছাগলের মন্দ করিতে গিয়া সবল ব্যাঘ্রের এই দশা হইল।

"পরের মন্দ করে যেই।
সেই মন্দে মরে সেই॥"

শিশুর পাঠকগণ সাবধান, তোমরা কখনও পরের মন্দ করিতে যাইও না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বাণীর মন্দির।

আরো দূরে— আরো দূরে—
ওই যায় দেখা আলোকের রেখা
স্থবর্ণ মন্দির চূড়ে
আরো দূরে—আরো দূরে।

ছাড় এই সিঁড়ি, চড় ওই সিঁড়ি,
যেয়োনারে ফিরি, চেয়োনারে ফিরে,
বন্ধুর দুর্গম ওই জ্ঞান-গিরি,
জয়-ধ্বজা যথা উড়ে
আরো দূরে—আরো দূরে।

অতি দীর্ঘ পথ, ছাড় মনোরথ,
কি শীত বসন্ত নিদাঘ শরৎ
ব্যাপি বর্ত্তমান, অন্ধ ভবিষ্যৎ,
থেকোনা পশ্চাৎ পড়ে।
আরো দূরে—— আরো দূরে।

হেথায় আরম্ভ, কোথা অবসান ?
সম্মুখে কেবলি অনন্ত উত্থান,
চলিয়াছে যাত্রী, শোন জয়গান
নিখিল জগৎ জুড়ে’।
আরো দূরে—আরো দূরে।

শ্রীমনোমোহন সেন।

সদুপদেশের ফল।

দস্যু রত্নাকর—মুনি বল্মীকি।

অতি প্রাচীনকালে চ্যবন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার রত্নাকর নামে এক পুত্র ছিল। পুত্রটী ছেলেবেলা হইতে বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিল; মাতা পিতার কথা শুনিত না; সারাদিন কেবল ঘুরিয়া বেড়াইত। পিতার বহু চেষ্টায়ও লেখাপড়া শিখিতে পারিল না। পিতা বৃদ্ধ হইলে সকলের ভরণপোষণের ভার রত্নাকরের উপর পড়িল। তখন রত্নাকর উপার্জ্জনের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল।

রত্নাকর নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষের আড়ালে অস্ত্র শস্ত্র নিয়া লুকাইয়া থাকিত। যে সকল লোক ঐ পথ দিয়া যাইত তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইত। যে জোর করিত দস্যুহস্তে তাঁহার প্রাণ যাইত। ঐ পথের কোন পথিকই রত্নাকরের হাত হইতে রক্ষা পাইত না।

একদা প্রাতে রত্নাকর গাছে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতেছিল। কিছুক্ষণ পর দুই জন সন্ন্যাসীকে বনের দিকে আসিতে দেখিল। ভগবান ব্রহ্মা ও তাঁহার পুত্র নারদ সন্ন্যাসীর বেশে ঐ পথে আসিতেছিলেন। রত্নাকর তাঁহাদিগকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইল এবং গাছ হইতে নামিয়া লাঠী হাতে গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। তাঁহারা নিকটে আসিলে রত্নাকর চিৎকার করিয়া বলিল, "তোমরা কোথায় যাইতেছ? আর অগ্রসর হইও না।"

ব্রহ্মা অতি নম্রভাবে বলিলেন, "ওহে বৎস! তুমি কে? তোমার গলায় পৈতা দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া তোমার স্বভাব এরূপ চঞ্চল কেন? হাতেই বা লাঠী কেন?"

রত্নাকর হাসিয়া বলিল, "আমার পরিচয়ে তোমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমি আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির জন্য প্রত্যেক দিন সর্ব্বদা বনে বনে ঘুরিয়া থাকি। পথিক দেখিলেই তাহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লই। দরকার বোধ করিলে প্রাণবধও করিয়া থাকি। এইরূপে যাহা কিছু পাই তাহা দ্বারা সকলকে ভরণপোষণ করি। আজ প্রথমেই তোমাদের মুখ দেখিয়াছি, বোধ হয় আমার অদৃষ্ট ভাল। যাহা হউক, তোমাদের মিষ্টি কথায় আমি ভুলিতেছি না। তোমাদের নিকট অর্থ বস্ত্রাদি যাহা আছে শীঘ্র দাও। নতুবা তোমাদিগকে, এই লাঠীর আঘাতে যমপুরী দেখাইব।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "স্থির হও বৎস! তুমি আমাদিগকে

এই জন্য বধ করিতে চাহিতেছ ? বনে বনে সমস্ত দিন ঘুরিয়া পরের ধন কাড়িয়া নেওয়ার চেয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা কি ভাল নহে ? ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য ফলমূলে পরিপূর্ণ বন আছে ; তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য শত শত নদ, নদী, হ্রদ, সরোবর ইত্যাদি রহিয়াছে। আর সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তোমার নরহত্যা করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে না ? নরহত্যা যে মহাপাপ। যাহা হউক, আমাদের নিকট যাহা আছে তাহা তোমাকে দিব। আগে আমাদের একটী প্রশ্নের উত্তর দাও। কাহার জন্য তুমি এ পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছ ? তুমি যে প্রত্যহ নরহত্যা করিতেছ ইহার জন্য তোমাকে বহুকাল কঠোর নরক ভোগ করিতে হইবে। তুমি কি ইহা জান না ? তোমার সেই মাতাপিতা ও স্ত্রী পুত্রাদি তোমার পাপের ভাগী হইবেন কি ?”

রত্নাকর উত্তর করিল, “আমি একাকী নরকে কষ্ট ভোগ করিব কেন ? আমার বৃদ্ধ মাতাপিতা এবং স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালনের জন্য আমি এই কাজ করিতেছি। আমার পাপের ফল আমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও ভোগ করিবেন।”

এই উত্তর শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন, “তাঁহারা তোমার পাপের ভাগী হইবেন একথা তোমাকে কে বলিল ? তুমি বাড়ীতে যাইয়া এ কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। তাঁহারা কি উত্তর দেন তাহা আমাদের নিকট বলিবে। ততক্ষণ আমরা এই গাছতলায় বসিয়া থাকি।”

রত্নাকর বলিল, “বুঝিয়াছি, তোমরা পালাইবার সুযোগ খুঁজিতেছ। না, তা হ’বে না।”

ব্রহ্মা বলিলেন, “আমরা পালাইব না। যদি তোমার

সন্দেহ হয়, তবে তুমি আমাদিগকে গাছের সহিত ভালরূপ বান্ধিয়া রাখিয়া যাও।”

রত্নাকর কিছুকাল চিন্তা করিয়া সন্নাসীদিগকে গাছে ভালরূপ বান্ধিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা পলাইতেছে কিনা, জানিবার জন্য পেছনে তাকাইতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল, “সাবধান পলাইও না; পলাবেত সমস্ত বন খুঁজিয়া বাহির করিয়া বধ করিব। আমি এখনই আসিতেছি।”

কতকদূর যাইয়া রত্নাকর ভাবিতে লাগিল—যাহাদের ভরণপোষণের জন্য নরহত্যা করি তাহারা যদি আমার পাপের ভাগী না হয় তবে আমার উপায় কি হইবে? মাতাপিতা ছাড়িয়া স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া একাকী আমাকে নরক ভোগ করিতে হইবে! কি ভীষণ! নরকে না জানি কত কষ্ট! যাই একবার সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি তাঁহারা আমার পাপের ভাগ নিবেন কি না?

বাড়ী যাইয়া রত্নাকর প্রথমে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার ঠিক উত্তর দিন। আপনাদের প্রতিপালনের জন্য প্রত্যহ বহু পাপকর্ম্ম করিতেছি। এ পাপের ভাগী আপনি হইবেন কি?

চ্যবন মুনি পুত্রের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “আমি তোর পাপের ভাগী হইব একথা তোকে কে বলিল? পুত্রের পাপ পিতার লাগে এ কথা কোন্ শাস্ত্রে শুনিলি? আমরা না খাইয়া ছেলে বেলা তোকে কত কষ্ট করিয়া পালন করিয়াছি।

এখন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। ভরণপোষণের ভার তোর উপর। যে প্রকারে পারিস্ পালন কর্। তোকে নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করিতে কে বলে? ঐ পাপের ভাগী আমি কখনই হইব না।”

রত্নাকর পিতার কথা শুনিয়া মাথা হেঁট করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট গেল। মাতাকে পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করায় তিনিও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “আমার একদিনের ধার শোধ দিতে পারে এমন কে আছে? আমি তোকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে রাখিয়াছি; এ ঋণ কিসে শোধ দিবি? আবার তোর্ পাপের ভাগ আমাকে লইতে বলিস্? এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোর লজ্জা বোধ হয় না?”

মাতার উত্তর শুনিয়া রত্নাকর বিষন্ন বদনে স্ত্রীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

স্ত্রী বলিল, “তুমি কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ কর তাহা আমরা কি জানি? তোমাকে কে নরহত্যা করিতে বলে? তুমি আমাকে বিবাহ করিয়াছ; অন্নবস্ত্র দ্বারা প্রতিপালন করিতে তুমি বাধ্য। অন্য পাপ পুণ্যের ভাগী আছি—কিন্তু ভরণপোষণের জন্য যে পাপ করিবে তাহার ভাগী হইব কেন? তুমি সন্তানদিগের জন্মদাতা; তুমি তাহাদিগকে পালন করিতে বাধ্য; তাহারাইবা তোমার পাপের ভাগী হইবে কেন?”

স্ত্রীর উত্তর শুনিয়া রত্নাকরের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। এবং কৃতপাপের জন্য বড়ই ভীত হইল। রত্নাকর

হতবুদ্ধি হইয়া পাপের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল। পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। তৎপর বনের সেই মহাপুরুষদিগের কথা তাহার মনে পড়িল। তাঁহাদিগের কৃপা পাইবার আশায় দৌড়িয়া বনে গেল। বনে যাইয়া তাঁহাদিগের বন্ধন খুলিয়া দিল! পা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে সকল ঘটনা জানাইল। এবং উদ্ধারের উপায় পাইবার জন্য মাটিতে লোটাইয়া কান্দিতে লাগিল।

ছদ্মবেশী ব্রহ্মার হৃদয়ে রত্নাকরের প্রতি দয়া হইল। তিনি রত্নাকরকে মাটি হইতে তুলিয়া সান্ত্বনা করিলেন। তৎপর নিকটবর্ত্তী সরোবর হইতে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। স্নান করিয়া আসিলে ব্রহ্মা তাহাকে পবিত্র "রাম" নাম জপ করিতে বলিলেন। পাপে রত্নাকরের জিহ্বা এরূপ জড় হইয়াছিল যে সে বহু চেষ্টায়ও "রাম"নাম উচ্চারণ করিতে পারিল না।

রত্নাকর কান্দিতে কান্দিতে মুনিগণের পা ধরিয়া বলিল, "প্রভু! আমাকে রক্ষা করুন; আমার পাপ মুখ হইতে ঐ নাম বাহির হইতেছে না। কিরূপে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে?"

রত্নাকরের অবস্থা দেখিয়া মুনিগণ চিন্তিত হইলেন। কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তুমি উল্টাভাবে অর্থাৎ ম-রা ম-রা এইরূপ বলিতে থাক। পরে তোমার মুখ হইতে 'রাম' নাম বাহির হইবে।"

এই কথা বলিয়া ছদ্মবেশী ব্রহ্মা ও নারদ অন্তর্হিত হইলেন।

রত্নাকর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অটলভাবে ঐ পবিত্র নাম জপ করিতে লাগিল। এখন এই বন তাহার তপোবনে পরিণত হইল। এইরূপে বহু বৎসর কাটিয়া গেল। তাহাকে অচেতন পদার্থ মনে করিয়া উইপোকা তাহার শরীর বেষ্টন করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিল। এবং এইরূপে তাহার শরীর এক বৃহৎ মাটির স্তূপে পরিণত হইল।

একদা ব্রহ্মা ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে এই মাটির স্তূপ-মধ্যে হইতে "রাম" "রাম" এই পবিত্র নাম শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ রত্নাকরের কথা তাঁহার মনে পড়িল। এবং তপস্যার কঠোরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তৎপর তিনি মাটির স্তূপ পরিষ্কার করিয়া রত্নাকরের তপস্যাজনিত শুষ্ক দেহ সজীব করিলেন। ব্রহ্মা রত্নাকরের তপস্যার ভূয়োসী প্রশংসা করিলেন। উই পোকার স্তূপকে বল্মীক কহে। সেই বল্মীক হইতে উৎপন্ন বলিয়া রত্নাকরের নাম হইল বাল্মীকি।

এই বাল্মীকিই জগতের আদি কবি; তাঁহার মুখেই প্রথম সংস্কৃত কবিতা বাহির হইয়াছিল। বাল্মীকিই রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। রামায়ণই জগতের প্রথম কাব্য। বাল্মীকিই জগতে প্রথম কবি; এমন সুন্দর নীতিপূর্ণ কাব্য বোধ, হয় আর নাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে।

জল্লাদ ও প্রহ্লাদ।

অনেক দিনের কথা সে যে
অনেক দিনের কথা ;
সত্য যুগের পরে তখন
পুরাণ ভুলছে মাথা।
হিরণ্যকশিপু নামে ছিল
বিরাট দৈত্য ;
মদে মাতাল থাকৃত সদাই
কু কাজেতে মত্ত।
প্রহ্লাদ নামে ছেলে তাহার
ভগবানের দাস,
ভগবানেই ছিল তাহার
অটল বিশ্বাস।
সে যে হরি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ নামে
ডাকৃত ভগবান ;

পিতার কিন্তু এসব নামে
জ্বলে উঠ্ত কাণ।
প্রহ্লাদেরে ভয় দেখাত
হরিদ্বেষী পিতা,
একটিবার সে বল্লে হরি
কেটে ফেল্‌বে মাথা।
ছেলে তাতে ভয় পেত না
ডাকৃত ভগবান,
সবার কাছে বল্‌ত হরি
রাখ্‌বে তাহার মান।
পিতা একদিন ভারী রেগে
বল্ল জল্লাদেরে,
ছেলের মাথা কেটে এনে
দিতে হবে তারে।
রাজার মাইনে খাচ্ছে জল্লাদ
উপায় তাদের নাই,
প্রহ্লাদেরে মশান মাঝে
নিয়ে গেল তাই।
চক্ষু মুদে প্রহ্লাদ তখন
বল্‌ছে "ভগবান

দেখো যেন নামের তোমার
হয় না অপমান।”
ঝনাৎ করে পড়্‌ল অসি
ভক্ত বীরের শিরে,
কাট্‌বে সে ত দূরের কথা,
অসি এল ফিরে !
দেখে এমন জল্লাদ তখন
ফিরে আস্‌ল ভয়ে,
ছেড়ে গেল দৈত্য রাজ্য
হরি নামটি নিয়ে।

শ্রীরেবতী মোহন মুখোপাধ্যায়।

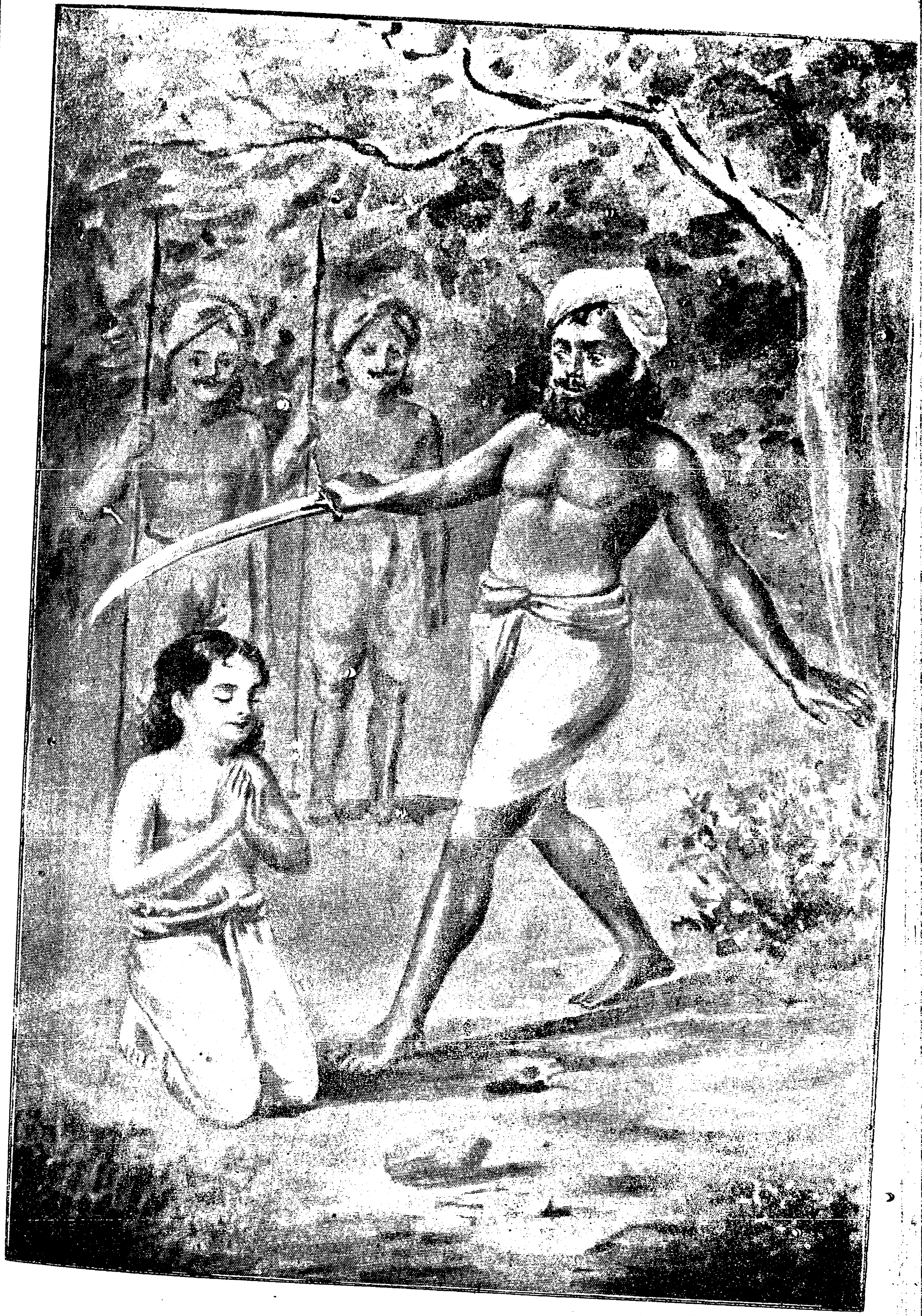

অসি-তলে প্রহ্লাদ।

দুর্গ।

সে আজ অনেকদিন হ'লো—উত্তর দেশে একজন যোদ্ধা বাস করতেন। দেখ্‌তে তিনি অতি সুন্দর,—দীর্ঘকায় বলবান জ্ঞানী—সকল অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। যেখানে তিনি যেতেন, সেইখানেই তাঁর জয় লাভ হ'তো। সুতরাং বড় বড় রাজা, রাজপুত্র সকলেই তাঁর সাহায্যের প্রার্থী হ'তেন।

সম্মান-সমাদর, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ধনরত্ন একে একে সকলই তিনি উপার্জ্জন করলেন,—অর্জ্জনের তাঁর আর বাকি রইলো না কিছু। বহুকাল পরে শেষে তিনি নিজের দুর্গে ফিরে এলেন। এক খোলা পাহাড়ের উপর তাঁর দুর্গ। গাছপালা নেই, লতাপাতা নেই! কিন্তু তখন তিনি মস্ত ধনী—ভারি তার যশ,—সে দুর্গটি তাই তাঁর কাছে বড় ছোট, বড় দীন বলে মনে হ'লো। সেটীকে ভেঙে ফেলে সমগ্র উত্তর দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় প্রাসাদ তুল্য একটি দুর্গ নূতন ক'রে তৈরি করাবেন স্থির করলেন।—এমন দুর্গ হ'বে যে কিছুতেই তার ধ্বংস হ'বে না।

মিস্ত্রী, স্থপতি, শিল্পী নিযুক্ত করা হলো। ক্রমে সেই অনাবৃত পাহাড়ের গায়ে জমকালো এক প্রসাদ তৈরি হ'য়ে উঠলো,—বাড়ী নির্ম্মাণ শেষ হ'য়ে গেলো। যোদ্ধা পাত্র, মিত্র, পরিজন সঙ্গে দুর্গে এসে ঢুকলেন।

ঘোড়ায় চড়ে' গর্ব্বভরে একবার তিনি দুর্গটি অবলোকন করলেন, বললেন—"আজ একটা এমন কিছু তৈরি হ'লো বটে, যা' আমার নাম চিরস্থায়ী করবে। এ দুর্গ অক্ষয় হ'য়ে থাকবে। এ'র উচ্চ চূড়া অনন্তকাল ধ'রে গগন স্পর্শ করবে।"

তাঁর পাশ থেকে কে বলে উঠলো—"কিন্তু দেখো—এ সবই বৃথা!"

যোদ্ধা ক্রুদ্ধনেত্রে ফিরে চাইলেন,—দেখলেন একটি চারাগাছ হাতে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

তিনি বললেন—"কি—সবই বৃথা! সম্মান বৃথা নয়। সম্মানের জন্য যে অসি চালনা করে, যশের খাতায়—গৌরবের ইতিহাসে সে ব্যক্তি অমর হয়ে থাকবে।"

হাতের চারাগাছটির দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে সন্ন্যাসী উত্তর করলে—"মাটির উপর ঘাসের মত যশ ক্ষয় পাবে। বাগানের ফুলের মত তা' ঝরে' পড়বে।"

যোদ্ধা বললেন—"কখনো না! এ দুর্গ চিরস্থায়ী হ'য়ে থাকবে। এই পাহাড়েরই মতন এটা অচল মজবুত। আর যতদিন এর অস্তিত্ব থাক্‌বে ততদিন এ'র নির্ম্মাতা—এ'র মালিকের নাম লোকসমাজে ঘোষিত হ'বে।"

তিনি ঘৃণাভরে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে চলে গেলেন। সন্ন্যাসী হেঁট হ'য়ে বসে হাতের সেই ছোট গাছটি মাটিতে পুঁততে লাগলো।

যোদ্ধা আবার অবজ্ঞামাখানো চোখে ফিরে চাইলেন, বললেন—"তুমি যে রকম কাজ করছো, সেরকম কাজ ধ্বংস পাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু যশ, সম্মান ঠিক এই কঠিন পাথরের স্তূপের মত। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ—এমন কি স্বয়ং কালের সাম্‌নেও এ স্তূপ অচল, অটল দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

সন্ন্যাসী একটি কথাও কইলে না। অত কোমল যত্নে যে ছোট গাছটি পুঁতেছিলো সে—তার জন্যে ভগবানের কাছে কেবল নীরব একটি প্রার্থনা জানিয়ে দূরের সমতল ভূমিতে চলে গেলো।

তারপর কত শত বৎসর কেটে গেছে—যেখানে একদিন দুর্গটি অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ দম্ভভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলো, এখন আর সেখানে একখানা পাথর পর্য্যন্ত নেই। কোথায় যে দুর্গটি—ছিল এখন আর তাই ঠিকই করা যায় না মোটে। কোনো গল্পগানে এখন আর সে যোদ্ধার কথা শুনা যায় না। চারাগাছটি যে পুঁতে গিয়েছিল, সেই দীনহীন সন্ন্যাসীর মত দুর্গের নির্ম্মাতার নামও আজ বিস্মৃতির কবলে কবলিত হয়েছে। কিন্তু সেই পাহাড়ের গায়ে—যেখানে একদিন একটি লতাও ছিল না—আজ সেখানে বড় বড় গাছে মস্ত এক বন হ'য়ে গেছে। বাতাসে সেই সব গাছের পাতা কম্পিত হয়,— কত

পাখী তাদের ডালে ব'সে মধুর-স্বরে গান করে। ক্লান্ত পথিক নীচের সমতল ভূমি থেকে ক্রমে সেই সবুজ গাছগুলির ছায়ায় বিশ্রাম করে, তাদের সৌন্দর্য্যে উল্লাসিত হয়।—আর ভগবান্‌কে অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে যায়।

দুর্গটি নষ্ট হ'য়ে গেছে,—কোথায় যে তা' ছিল, তাই কেউ জানে না। কিন্তু সন্ন্যাসীর পোঁতা গাছটি মরে নি—ক্রমশঃ বেড়ে বেড়ে এখন সেটি থেকে মস্ত এক বন জন্মে' গেছে। সে বনটি আর নষ্ট হ'বার নয়!

শ্রীসুধীরকুমার সেন।